ধর্মীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর সংগ্রাম।

আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে শিরোনামে উল্লেখিত বিষয় দু'টির সংজ্ঞা নিরূপন করা যাক। মহাবিশ্বের পরিচালনাকারী হিসাবে ঐশ্বরিক শক্তির উপর বিশ্বাস ও ভয়ের অনুভূতিই ধর্ম। সভ্যতার উষা লগ্নে মানুষ প্রকৃতির হাতের পুতুল ছিল। বাচার তাগিদে তাকে প্রতিনিয়ত প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে। যুগ যুগ ধরে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মানুষের অর্জিত সাফল্যের অংকিত প্রাতমূর্তি, যা বংশ পরাম্পরায় শ্রদ্ধা ও ভয়ের সাথে মানসপটে রক্ষিত হয়েছিল, তার নাম স্রষ্টা।

সভ্যতার অগ্রগতির প্রথম ধাপ হলো পরিবার গঠন। পরিবার থেকে গোষ্ঠি এবং গোষ্ঠি থেকে সমাজের উদ্ভব। সমাজ হলো রাষ্ট্রযন্ত্রের সৃষ্টিকর্তা। পুলিশ বিহীন আদি পরিবার, গোষ্ঠি ও সমাজের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে আইনের প্রয়োজনীযতা দেখা দেয়। আদি মানুষ কর্তৃক রচিত উক্ত আইন ঐশ্বরিক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে শাস্ত্র নামে অবিভূত হয়, যেমন হিন্দু শাস্ত্রের বেদ। সমাজ বিবর্তনে শাস্ত্র থেকে ধর্মের সৃষ্টি হয়। ধর্মের বিবর্তনে ইহুদী, খ্রীষ্টান ও ইসলামের আবির্ভাব ঘটে, ফলে সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী সৃষ্ট ঐশ্বরিক আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে যথাক্রমে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের নিজ নিজ বাইবেল এবং মুসলমানদের কোরাণ রচিত হয়। মানুষ ধর্মীয় কাল শেষ করে আধুনিক কালে প্রবেশ করেছে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের সাথে সমাজ পরিবর্তিত হয়েছে, ফলে বিভিন্ন ধর্মের আদি আইনের সংস্কার হয়েছে। সংঘঠিত পরিবর্তন সমূহকে বাধাগ্রস্থ করে সমাজকে ধর্মীয় আদি আইনের পর্যায় নিয়ে যাওয়াকে ধর্মীয় মৌলবাদ বলা হয়।

শ্রেনী বিভক্ত সমাজে শোষক ও শোষিত শ্রেনীর দ্বন্দ্বই হলো মৌলিক দ্বন্দ্ব। কিন্তু এই মৌলিক দ্বন্দ্ব ছাড়াও সমাজে আরো অনেক দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। মৌলিক দ্বন্দ্বের সাথে অপরাপর দ্বন্দ্বের পার্থক্য হলো, মৌলিক দ্বন্দ্ব যেখানে শ্রমজীবী জনগন ও তাদের শোষকদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, সেখানে অপরাপর দ্বন্দ্বগুলি হলো জনগনেরই বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। এই অপরাপর দ্বন্দ্বের একটি হলো সাম্প্রদায়িকতা। এই দ্বন্দ্বগুলি জনগণের মধ্যেকার অবৈরী দ্বন্দ্ব হলেও, কার্যক্ষেত্রে দেশীয় শাসকেরা এবং সাম্রাজ্যবাদীরা এইগুলিকে বৈরী দ্বন্দ্বে পরিণত করে।

ভারত উপমহাদেশে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তির প্রশাসনিক সুবিধার্থে সৃষ্ট "বিভাজন ও শাসন" নীতির ফসল। ফলে দ্বিজাতি তত্ত্বের উদ্ভব। কায়েমী স্বার্থে পাঞ্জাব, ইউপি, বিহার ও বাংলার মুসলিম জমিদারেরা কংগ্রেসের বিপরীতে মুসলিম লীগ নামের রাজনৈতিক দল গঠন করে। ভারত বিভক্ত হয়।

সামান্তবাদী শোষণে জর্জরিত পূর্ব পাকিস্তানের কৃষককুলের শিক্ষিত সন্তানেরাই বাঙ্গালী মুসলমানদের আদি মধ্যবিত্ত শ্রেনী, যারা দ্বিজাতি তত্ত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করতঃ হিন্দু-মুসলিম পৃথক নির্বাচনের বিপরীতে বাঙ্গালীদের ঐক্যবদ্ধ নির্বাচন, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা (১৯৫৪ সালের ২১ দফায় অন্তর্ভূক্ত) প্রতিষ্ঠার জন্য লড়তে থাকে। পাকিস্তানী সামরিক একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে বাঙ্গালীরা স্বাধিকার আন্দোলনে (১৯৬৪ সালের ৬ দফা) অবতীর্ণ হয়। উক্ত আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন শ্রেনীর বাঙ্গালীর একছত্র নেতা হিসাবে শেখ মুজিব প্রতিষ্ঠা পায় এবং তাকে বঙ্গবন্ধু খেতাবে ভূষিত করা হয়। এই আন্দোলনের এক পর্যায় ১৯৬৯ সালের ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারি আইউব খানের পতন

এবং সমাজতন্ত্র জনতার দাবীতে পরিণত হয়। ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের প্রথম অবাদ নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত না করে বাঙ্গালীদের উপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বর্বরচিত আক্রমন মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করে। বাঙ্গালী জাতিয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নের দাবীতে বাঙ্গালীরা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তানের ধর্মীয় মৌলবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে জয়ী হয়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

স্বাধীনতা উত্তর বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেনী শাসক গোষ্ঠির প্রতিক্রিয়াশীল অংশ বঙ্গবন্ধুর উপর আস্থা স্থাপনে ব্যর্থ হয়ে, তাকে হত্যা করে সামরিক একনায়কতন্ত্র কায়েম করে। বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের প্রতিক্রিয়াশীল এই অংশ ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকে নির্বাসিত করে এবং বাঙ্গালী জাতিয়তাবাদের পরিবর্তে বাঙ্গালী মুসলিম জাতিয়তাবাদ অর্থ্যাৎ বাংলাদেশী জাতিয়তাবাদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সংবিধান সংশোধন করে। অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীরা পরাজিত দ্বিজাতি তত্ত্বের সমর্থক মুসলিম লীগার, রাজাকার, নেজামী ইসলামী, কায়েমী স্বার্থবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল, অতিবামের দল ছুট অংশ ও আওয়ামী লীগ বিদ্বেষীদের সমন্বয় রাজনৈতিক দল গঠন করে এবং জামাতকে রাজনৈতিক মঞ্চে নিয়ে আসে। বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের বর্ণিত এই প্রতিক্রিয়াশীল অংশ নিজ শাসন ও শোষণ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ধর্মীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা উৎসাহ দিয়ে চলছে। এমতাবস্থায় আলোচ্য এই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠি থেকে পরিত্রানের লক্ষ্যেঃ (১) মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তিসহ সকল ধর্ম নিরপক্ষ ও প্রগতিশীল গোষ্ঠির ঐক্য প্রতিষ্ঠা, (২) সকল পক্ষের কাছে গ্রহনযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে তত্ত্বধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সংস্কার, (৩) ’৭২ এর সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার করতে হবে।

সেতারা হাশেম ০৫/১৪/০৫